যোগেন চৌধুরী-র দাম্পত্য

দেবকুমার সোম এবার কলম ধরছেন শিল্পী যোগেন চৌধুরীকে নিয়ে। শিল্পীর দাম্পত্য পর্যবেক্ষণের ছবি এই লেখায়।

নর-নারীর সার্বিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান, অহংয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শরীর-শরীর খেলা, নীরব প্রেম-উত্তাপ শিল্পের ক্ষেত্রে অতি উর্বর উপাদান। সেই প্রাচীন সমাজ জীবন থেকে আজকের উত্তর আধুনিক সময় অবধি বিষয় হিসেবে নর-নারীর সম্পর্ক অন্যতম প্রধান সন্দেহ নেই। তবে, এই বিস্তীর্ণ কাল-প্রবাহে পুরুষ চিত্রীদের দৃষ্টিতে নারীর মহিয়সী রূপই প্রধান হয়ে উঠেছে। যদিও, বাস্তবের নিরিখে নারীর অবস্থান তেমন মহান নয়। অন্তত, আমাদের মতো খুব গোলমেলে এক ধর্মভীরু সমাজে। ধর্মের ধ্বজা যাদের হাতে থাকে, তাঁরা যেমন মনে করেন নারী নরকের দ্বার। আবার বিপ্রতীপে তাঁরা নারীকে কেবল শরীর সর্বস্বই মনে করেন। ভোগবাদের প্রাচুর্যও নারীকে কেবলমাত্র পণ্য করে। নারী শরীরকে জীবিকা করে। ফলে, সেই জটিলতার অন্তর্গত রূপটা তেমনভাবে শিল্প-সাহিত্যে চিত্রিত হয় না। যেমনটা হওয়া উচিত। অর্থাৎ, বলার কথা এই, সামাজিক অবস্থানে নারী যতই পুরুষের খাদক হোক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে মিথ্যে মিথ্যে শিল্প-সাহিত্যে মহিয়ষী করে তোলে।

এত গেল নর-নারীর সামাজিক অবস্থান। আমরা যদি ব্যক্তি জীবনে ঢুঁ মারি, তবে দেখব, এখনও গ্রাম-প্রদেশে সংসার জীবনে নারী একজন বিনিপয়সার যৌনদাসী। পুরুষের ঘর-গেরস্থালির রাখয়ালি। আর নাগরিক জীবনে না-পাওয়া দাম্পত্য সুখ। সন্তানের ধারণ, জন্মদান আর তাকে পাল-পোষ করাই তার একমাত্র ব্রত। এর মধ্যে থেকে কেউ কেউ পা-পিছলে অন্যপুরুষের প্রতি আসক্ত হলে, নষ্ট, ভ্রষ্ট, পতিতা। আর খুব সংবেদনশীলা হলে এক ছাদের নীচে বাস করে বিছানায় কাঁটাতার বেড়া। রবীন্দ্রনাথের চারুলতা।

এই পর্যবেক্ষণ নতুন নয়। বরং এই সব জ্যান্ত বিষয় নিয়ে আজকাল কথা চালাচালি খুব হয়। ফলে নারীবাদী জার্গনটি এখন সুপযুক্ত। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে বয়ে চলে, যেমন আরও অনেকের মধ্যেই। আমরা মেয়েদের প্রতি সংবেদনশীল বলে, মেনিমুখো, ন্যাকাষষ্ঠী। পাঠক, মূল বিষয়ে যাবার আগে আপনাকে আর একটু বোর করি। এতক্ষণ আমি যা কিছু উল্লেখ করলাম, তা আজকের কনটেক্সটে একদেশদর্শী মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই, নারীর চিরদুখী ছবির পেছনে যে নিস্পৃহ প্রেমিকা মন খেলা করে, পুরুষকে কুহকের মতো পথে বসায়, সে-তথ্যও এখানে উল্লেখ থাক। বহু মেয়ে আজকাল জানেন, মেধা নয়, শরীরই তাঁর মূলধন। ফলে শরীরের ব্যবহার, ক্রম ব্যবহার সাফল্যের শিখরে কাউকে কাউকে পৌঁছে দেয়।

দম্পতি কিংবা যুগল বা কাপল বিষয়ে যোগেন চৌধুরী অসংখ্য ছবি কিংবা স্কেচ রচনা করেছেন। নর-নারীর সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সামাজিক অবস্থানের মূল সূত্রগুলোকে আবিষ্কার করতে চেয়েই বুঝি চিত্রী যোগেন চৌধুরী এক বিশেষ প্রয়োগের দিকে ঝুঁকে ছিলেন বলা যায়। দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু কলোনিতে ছাত্রাবস্থা অতিবাহিত করা শিল্পীর সমগ্র ছবির জগতে অন্ধকার প্রেক্ষাপটের আধিক্য। তার ওপর পুরুষ এবং নারীর মধ্যেকার সমীকরণেও যে অন্ধকার ভূগোল রয়েছে, তাও তিনি যুগল বা দম্পতি বিষয়ক ছবিগুলোতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ১৯৬৫ সালে প্যারিস যাওয়ার আগে তিনি তেলরঙের যে ছবিটি এঁকেছিলেন সম্ভবত যুগল সিরিজের সেটাই তাঁর প্রথম বড়ো কাজ। তখন তিনি সদ্য আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেড়িয়েছেন। কলেজে পড়াকালীন শিল্পী বন্ধু সুনীল দাসের সঙ্গে মিলে লোকারণ্যে স্কেচ করে চলেছেন। কখনও ঘোড়দৌড়ের মাঠে, কখনও বা শিয়ালদার রেল স্টেশনের উদ্বাস্তু পরিবারের। ততদিনে তিনি প্রবলভাবে দেগা এবং কাথে কোলভিৎসে আচ্ছন্ন। তবুও তার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের শিল্পী যোগেন চৌধুরী ফুটে উঠছেন। এমন সময়ের ছবি নারী-পুরুষের এই যুগল। ছবির বিষয় এক বৃদ্ধা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে তাঁর বৃদ্ধ স্বামী। দুজনের মুখ বয়সোচিত কারণে বিকৃত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, একমুখ বিরক্তি নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রেক্ষাপটে ঘন কালচে রঙ, তাঁদের প্রায়োন্ধকার অতীত অভিজ্ঞতার সাক্ষী। সেই বছরে যোগেন প্যারিসে গেলেন ছাত্র হিসেবে। ফিরে এলেন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট গ্যালারিগুলোয় খ্যাতবান শিল্পীদের মূল কাজগুলো দেখে। এরপরে কিছুকাল তিনি চেন্নাইতে ছিলেন। সেখানে তাঁর দাম্পত্য জীবনের শুরু। শুরু ছবিতে ইন্দ্রিয়ঘন অভিব্যক্তির প্রভাব। এইসময় তিনি সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় ছবি আঁকা শুরু করলেও যুগল বিষয়ে ছবি আমরা পাইনা।

রাষ্ট্রপতি ভবনের শিল্প সংগ্রহের কিউরেটর পদে থাকার সময় (১৯৭২-৮৭) বিষয় হিসেবে যুগল ফের ফিরে এল। কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে পরবর্তী সময়ে বিষয় হিসেবে তিনি যে যুগলকে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলেন, তার সূত্রপাত তাঁর দিল্লিবাসের সময়। মাধ্যম হিসেবে প্যাস্টেল আর কালি, যা তাঁর চিত্রী জীবনের সবচেয়ে সহজাত ও প্রকৃতিগত মাধ্যম, তাই ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও আবার ফেল্ট কালির স্কেচও করেছেন। দিল্লি পর্বের কিছু জনপ্রিয় ছবি দেখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ১৯৮২ সালের এই ছবিটা।

একজন বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, বসবার কায়দায় স্পষ্ট তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। তিনি একজন নবীনা মহিলার হাত নিজের কোলের ওপর টেনে এনেছেন। ভঙ্গিতে স্পষ্ট রাজনীতিবিদের চোখে লালসা। ব্যবহার অশালীন। মহিলার চোখ কালীঘাটের পটের প্রতিরূপ হলেও ভয়ার্ত। মহিলা স্পষ্টতই পরিস্থিতির শিকার। রাষ্ট্রপতিভবনে বসবাসের ফলে যোগেন চৌধুরী ঘনিষ্টভাবে দেখেছেন এইসব প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদের স্বরূপ। তাঁর ছবিতে যে স্যাটায়ার আমরা দেখি, তার উদ্ভব শিল্পীর জীবন অভিজ্ঞতা। মানুষের মনের বিকৃতি তার দেহ অবয়বকে ডিসটর্ড করে ক্যানভাসে এঁকে যোগেন চৌধুরী ছবিতে স্যাটায়রকে অন্য এক উচ্চতায় স্থান দিয়েছেন।

১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি ভবনে বাসের সময় যোগেন চৌধুরীর আর একটা বিখ্যাত যুগল চিত্র দম্পতির ছবি। দুজনের বেশভুষা, বসবার ভঙ্গিমায় ভারতীয় সমাজের আদল। মহিলার মুখ ঘোমটা টানা, বসবার ভঙ্গি নিতান্ত আটপৌরে। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তবে তাঁর চাহনি তির্যক। সংসারে তাঁর অবস্থান, তাঁর গুটিয়ে রাখা দেহবল্লরীতেই স্পষ্ট। পুরুষটির মুখে অভিজ্ঞতার চিহ্ন। শালীনতা বজায় রেখে গায়ে চাদর নিয়েছেন। তাঁর মুখে মধ্যবিত্ত এক সংসারী মানুষের অভিব্যক্তি। এরা স্বামী-স্ত্রী। বসে আছেন। কিছুর প্রত্যাশায়। সন্তানের পথ চেয়ে কি? কিংবা সংসারে এতটা পথ হেঁটে এসে ক্ষণিক বিশ্রান্তরে। এই ছবিটি বিরল। কারণ, চিত্রী যোগেন চৌধুরী এখানে কোন বৈপরীত্য হয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত সত্ত্বাকেই বিষয় করেছেন।

আর্ট কলেজের সময় থেকেই যোগেন চৌধুরীর ঝোঁক মানুষের প্রতি। সহপাঠী সুনীল দাস যখন ক্রমাগত, বিরামহীন অধ্যাবসায়ে ঘোড়ার স্কেচ করতেন, তখন যোগেন চৌধুরী শিয়ালদহ স্টেশনে শরণার্থী শিবিরে ঢুঁ মারছেন মানুষের শরীরের স্কেচ প্র্যাকটিশের মানসিকতায়। তাঁদের উদ্বাস্তু কলোনির গেরস্থালির জীবন থেকেও চিত্রী খুঁজে নিচ্ছেন মানুষের আসন, বসন, ব্যবহার। তাঁর প্যারিস যাত্রা, তাঁকে ছাত্র হিসেবে খুব বেশি কিছু যে দিতে পারেনি, তা তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন। ফলে দেশে ফিরে যখন তিনি নিজস্ব চিত্রভাষ আবিষ্কারে মগ্ন হলেন, তখন বাংলার লোকশিল্প, বিশেষত পটের ছবি তাঁকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করেছিল। মূলত দেশজ শিল্পরীতির পথেই ছিল তাঁর চিত্রভাষ আবিষ্কারের অনিষ্ঠ। রাষ্ট্রপতি ভবনে যখন কাজের সূত্রে তিনি যোগ দিলেন, তখন তিনি শিল্পী হিসেবে তো বটেই, সংসারি মানুষ হিসেবেও পরিপক্ক। আর দিল্লির মতো শহরে বিচিত্র ভাষাভাষীর মানুষ, বিচিত্র স্বভাব-চরিত্রের এমন সমাবেশ আর কোথায় আছে? দিল্লী তো এক হিসেবে ছোট-খাটো একটা ভারত। এখানেই যোগেন চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামাজিক সমীকরণগুলোকে মিলিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। নর-নারীর যুগল চিত্রই তাঁর প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠল। তিনি সারাজীবন গৃহীর জীবন কাটিয়েছেন। বোহেমিয়াম জীবনের কোন টান কখনও তিনি অনুভব করেননি। ফলে বিষয় হিসেবে যখন যুগল হয়ে উঠল তাঁর ছবির মুখ্য ভাবনা, তখন তাঁর ছবিতে বুনোটের এক নতুন ঘনত্ব এল। এই ঘনত্ব ছবির বিষয়কে আরও সংবেদনশীল করল। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেন নর-নারীর সম্পর্কের বিচিত্র টান-পোড়েন। তবে দিল্লীবাসের সময় যুগলচিত্র যতটা গদ্যময়। পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনে থিতু হয়ে সেই বিষয় অনেক কাব্যময়। হতে পারে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁকে প্রভাবিত করেছে লিরিকধর্মী চিত্র রচনায়। কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে দর্শক হিসেবে আমরা অন্য এক যোগেন চৌধুরীকে পাই।

১৯৮৭ সালে শান্তিনিকেতনে এই ছবিটি রচনা করেছিলেন যোগেন চৌধুরী। এখানে দম্পতিরা সম্পূর্ণতই বাঙালি। তাঁরা মুখোমুখি বসে। ঘনিষ্ট তাঁদের চাহনি। যেমনটা হতে পারে। দাম্পত্য প্রেমালাপ। মহিলার যৌবন এখনও সপ্রাণ। এরা সম্পন্ন গৃহী। চিত্রী এখানেও একটা সার্বিক মিলন আনতে চেয়েছেন। খুব লিরিক্যাল এই ছবি।

২০০৩ সাল। চিত্রী যোগেন চৌধুরীর মেটামরফসিসের সময়কাল। যে সময় থেকে উদ্ভস বা ক্ষত সিরিজের চিত্র রচনা করছেন। দুনিয়াজোড়া সন্ত্রাসবাদ, পশ্চিমবাংলার বাম জমানার অধঃপতন। শিল্পী হিসেবে তখন তিনি অস্তিত্বের সংকটে। তখনও তিনি যুগলের ছবি রচনা করেছেন। যেমন এই ছবিটা। নারী-পুরুষ দুজনেই নগ্ন। মহিলা কৃষ্ণবর্ণা। পুরুষটি তুলনায় ফর্সা। আমাদের সমাজে নর-নারীর চামড়ার রঙের এই প্রভেদ, তাঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

পুরুষের চোখে অশালীন দৃষ্টি। কামনা। লোভ। মহিলার মুখ অধঃবদন। ক্ষত সিরিজের পূর্বাপর হিসেবে খুব স্পষ্টভাবে ধরা আছে পুরুষের পিঠের অ্যানাটমি।

নিবন্ধ শেষ করব আমার প্রিয় দুটো ছবির কথা বলে। দুটো ছবিই শান্তিনিকেতনে সৃষ্ট। রচনাকাল ২০০৪। এই ছবি দুটো চিত্রী যোগেন চৌধুরীর জীবনের নতুন এক মাইলস্টোন। তখন তিনি সামগ্রিক বাম রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। এর কিছু পরে রাজ্য জুড়ে পরিবর্তনের আওয়াজ উঠলে চিত্রী যোগেন চৌধুরী, তাঁর আরও কিছু সহচিত্রীর সঙ্গে বিরোধী রাজনীতিতে অংশ নেবেন। ঠিক এই সময়ে রচিত এই দুটো ছবি দেখলে স্পষ্টতই অনুভব করা যায় যোগেন চৌধুরী নামক এই সময়ের অতি শক্তিমান একজন ভারতীয় চিত্রীর শিল্পের চরম দক্ষতায় উত্তরণ।

এ চিত্রটি দেখলেই মনে পড়ে যায় *বনলতা সেন* কবিতার সেই অমোঘ লাইনটি। 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার'। এমন লিরিক্যাল, ব্যাঞ্জনাধর্মী ছবি সারাজীবনে খুব কমই রচনা করেছেন। কবিতার কাছাকাছি, কিংবা কবিতায় উত্তীর্ণ এই রচনা সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার এক সফল উদাহরণ সন্দেহ নেই। নর-নারী মুখোমুখি। কী দিঘল তাদের চোখের দৃষ্টি। প্রেমময়। শালীন। মেয়েটি তার থুতনির কাছে ডান হাত এনে তার ইন্টেলেক্টকেই প্রকাশ করছে। সমীহ আদায় করছে দর্শকের। ছবির নায়কেরও। আমাদের কলেজ জীবনে পুজো সংখ্যার প্রতিক্ষণ পত্রিকায় উপন্যাসের সঙ্গে থাকত যোগেন চৌধুরীর চিত্রকর্ম। তিনি ছাড়াও প্রকাশ কর্মকার, মনু পারেখ, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকর্ম ঠাঁই পেত সেখানে। যোগেন চৌধুরীর লিরিক আমার মতো অকিঞ্চন এক দর্শকের মনে গভীর সাড়া তুলেছিল সন্দেহ নেই। এই ছবিটার পাশাপাশি আর একটি ছবি, একই বছরে শান্তিনিকেতনে রচনা করেছিলেন যোগেন চৌধুরী।

এবং কী আশ্চর্য এই নতুন রীতিতেই তিনি থিতু হলেন কিছুদিন। উপকরণহীন, ভূমিকাহীন এক ম্লাণহীন রেখাচিত্রে স্নাত হল তাঁর যুগলচিত্র। এখানেও নর-নারীর প্রেম। মেয়েটির চোখে প্রেমিকের প্রতি অপার মুগ্ধতা। পুরুষটিও রূপমুগ্ধ। সে-সব কিছু নয়। দেখার বিষয় হল ছবির প্রেক্ষাপট। সেই অন্ধকার, নিভু-নিভু ছায়া গাঢ় প্রেক্ষাপট, যা চিত্রী যোগেন চৌধুরীর সিগনেচার, সেই প্রেক্ষাপট কোথায় গেল? নেই অজস্র

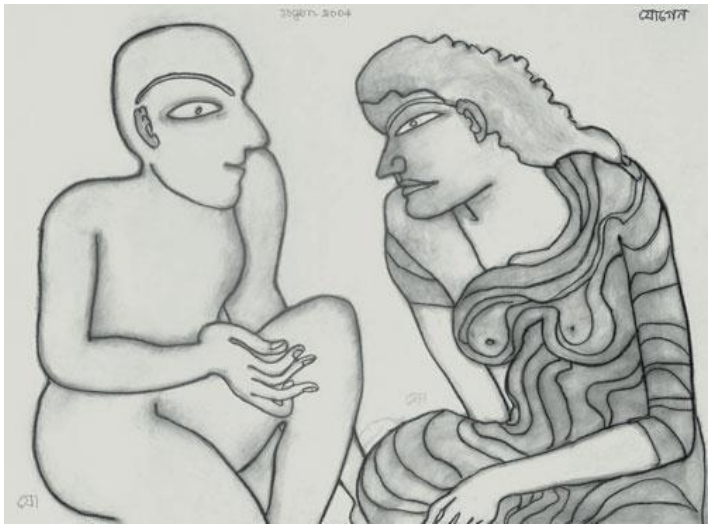

কাটাকুটি। রঙের বুনোট? আর পুরুষটিকে দেখুন? নগ্ন। অথচ, অ্যানাটমিতে ডিটেলিং নেই। মেয়েটির শাড়ি সাবেক যোগেন চৌধুরীর কথা বললেও, পুরুষটির এই আবরণহীন উন্মোচন এরপরে ব্যবহৃত হতে থাকল যোগেন চৌধুরীর এই পর্যন্ত ছবি রচনায়। আর এভাবে আমাদের কালের অন্যতম সেরা চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী নর-নারীর যুগল ছবিতে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে আজ অন্য এক পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে। আমরা অপেক্ষায় রয়েছি।